‘স্বচ্ছ বাজেট’ নিয়েও ভেবে দেখতে পারেন

বাজেটে অর্থমন্ত্রীকে বিভিন্ন স্বার্থের টানাপড়েন সামলাতেই হয়। অরুণ জেটলি বল্গাহীন সংস্কারের পথেও হাঁটেননি, আবার আম আদমির কথাও পুরোটা ভাবেননি। তাতে দোষ নেই। কিন্তু, তাঁর বাজেটের অস্বচ্ছতা সাধারণ মানুষকে ভুল বোঝাচ্ছে। সেটা হতাশাজনক।

এবারের বাজেট কেমন হল, তা বলতে গিয়ে নরেন্দ্র মোদী পাঁচটি ইংরেজি বিশেষণ ব্যবহার করেছেন— প্রোগ্রেসিভ, পজিটিভ, প্র্যাকটিকাল, প্র্যাগম্যাটিক, প্রুডেন্ট। ‘পারফেক্ট’ শব্দটা ব্যবহার করলে এক কথাতেই কাজ মিটে যেত। সে যাই হোক, অনুপ্রাসে তাঁর আসক্তি না হয় খানিক বেশিই। কিন্তু, নিজের কাজের বিচারে নিজেই পঞ্চমুখ (বা পঞ্চ-বিশেষণ) হওয়াটা সম্ভবত নিরপেক্ষ বিচারের সেরা মাপকাঠি নয়। তাই প্রশ্ন হল, অরুণ জেটলির এই বাজেটে কর্পোরেট ইন্ডিয়া বা আম আদমির প্রতিক্রিয়া কী? বাজেট মানে সরকারের জমা-খরচের হিসেব। যতই ‘সবকা সাথ, সবকা বিকাশ’ বলা হোক না কেন, সবাইকে খুশি করে বাজেট পেশ করা কোনও সরকারের পক্ষেই সম্ভব নয়। বাজেট মানেই, কিছু বাড়লে অন্য কিছু কমবে। তাই বাজেটের পাল্লা কার দিকে ঝুঁকে থাকল, সেটা মস্ত প্রশ্ন।

বিনিয়োগকারীদের মুখের কথা শুনে তাঁদের প্রতিক্রিয়া বোঝা অসম্ভব। কোনও বাজেট সম্বন্ধেই খুব নেতিবাচক প্রতিক্রিয়া জানানো তাঁদের ব্যবসায়িক স্বার্থবিরোধী। কিন্তু, শেয়ার বাজারের সে বাধ্যবাধকতা নেই। সেখানে সূচকের ওঠাপড়া বিনিয়োগকারীদের মনের কথা স্পষ্ট করতে বাধ্য। সেনসেক্স বলছে, দিনের শেষে বাজার চড়েছে, তবে সামান্যই। বলা হচ্ছে, গত চার বছরে এই প্রথম বাজেটের দিন শেয়ার সূচক খানিক বাড়ল। কিন্তু ভুলে গেলে চলবে না, গত বছরেও জেটলিই বাজেট পেশ করেছিলেন। আর শুধু তাই না, শেয়ার বাজারের এই তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়াই যদি দেখি, তা হলে সাম্প্রতিক কালে আর যে দুই বছর এই সূচক বেড়েছিল, সে দুই বছরেই (২০১০ আর ২০১১ সাল) এই বৃদ্ধির হার ছিল এ বারের থেকে বেশি। যে হেতু মোদীর বিপুল ব্যবধানে ভোটে জেতার পেছনে একটা বড় কারণ ছিল দ্বিতীয় ইউপিএ সরকারের শেষ দুই বছরের আর্থিক শ্লথতা এবং নীতি-পঙ্গুতার প্রতি অসন্তোষের পাশাপাশি মোদীনমিক্সের জাদুকাঠিতে অচ্ছে দিনের হাতছানি, বিজনেস প্রেস এবং অর্থনীতিবিদদের প্রতিক্রিয়ায় স্পষ্ট ‘যাহা পাই তাহা চাই না’ গোছের প্রত্যাশা ভঙ্গের সুর। অনুমান করা চলে, নরেন্দ্র মোদীর কাছে তাঁদের প্রত্যাশার সুর এত উঁচু তারে বাঁধা ছিল যে এই বাজেটে তাঁদের মন ভরেনি।

আম আদমির কোনও শেয়ার বাজার নেই যাতে তাঁদের প্রতিক্রিয়ার একটা নিরপেক্ষ ছবি পাওয়া যায়। যেটা আছে, তা হল ভোট। মোদীনমিক্সের কতটা প্রচার কতটা বাস্তব, তা নিয়ে সন্দেহের অবকাশ থাকলেও, তাঁর রাজনৈতিক বিচক্ষণতা নিয়ে চরম বিরোধীরাও প্রশ্ন তুলবেন না। দিল্লির সাম্প্রতিক নির্বাচন সারা দেশের তুলনায় ছোট মাপের হলেও, সেখানে মোদীর সর্বাত্মক চেষ্টা সত্ত্বেও তাঁর দলের ধূলিসাৎ হবার পেছনে আছে আম আদমির সড়ক-বিজলি-পানি এবং জীবনযাত্রার মান নিয়ে অসন্তোষ। এটা ঠিক যে মোদী সরকারের এক বছরও সম্পূর্ণ হয়নি, এবং বিশ্ববাজারে তেলের দাম কমায় মূল্যস্ফীতি অনেকটাই নিয়ন্ত্রণের মধ্যে এসেছে। ফলে, তাই এতটা অধৈর্য হওয়া হয়ত উচিত নয়। কিন্তু শেয়ার বাজারও যেমন অনেকটাই যুক্তিতে চলে না, সেন্টিমেন্টে চলে, একই কথা ভোটারদের ক্ষেত্রেও খাটে।

সেন্টিমেন্টের ধর্মই হল, এই মুহূর্তে কী হচ্ছে আর তার থেকে ভবিষ্যতে কী হবে, তাই নিয়ে একটা তাৎক্ষণিক বিচার। এই বিচার চরিত্রে স্থিতিশীল নয়। বিবিধ কারণে, ক্ষণে ক্ষণেই, মত পাল্টায়। বিচক্ষণ রাজনীতিক মাত্রেই জানেন, এই অস্থিরমতি ভোটার-দেবকে তুষ্ট না রাখতে পারলে সমূহ বিপদ— অর্থনীতিবিদ আর অন্য বিশেষজ্ঞরা যতই উল্টো সুরে, যুক্তি দিয়ে কথা বলুন না কেন, ভোটারের মন রাখা বড় দায়। মোদী জানেন, প্রথম ইউপিএ সরকার এবং দ্বিতীয় ইউপিএ সরকারের প্রথম দু-তিন বছর আর্থিক বৃদ্ধি বা দারিদ্র দূরীকরণের রেকর্ড কোনও দিক থেকেই খারাপ ছিল না। কিন্তু, সেই রেকর্ড কংগ্রেসের রাজনৈতিক নৌকাকে রক্ষা করতে পারেনি। ইউপিএ-র শেষ কয়েক বছরে মূল্যস্ফীতি এবং আর্থিক বৃদ্ধির হারের শ্লথতা নিয়ে বিক্ষোভ সর্বগ্রাসী হয়েছিল, যার পূর্ণ সুযোগ নিয়েছিলেন মোদী। কিন্তু এখন ভাল মন্দ যাই হোক না কেন এবং তাতে সরকারের দায় থাকুক বা না-ই থাকুক, ভোটার দায়ী করবে মোদী সরকারকে।

লোকসভায় তুমুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা, এবং ছাপ্পান্ন ইঞ্চি ছাতির বহুপ্রচারিত দৃঢ়তা থাকা সত্ত্বেও কেন মোদীর এই বাজেট এত সাবধানী এবং কোনও বড় সংস্কারের চিহ্ন কেন এখনও দেখা যাচ্ছে না, সেই প্রশ্নের উত্তর লুকিয়ে আছে এখানেই। সত্যি কথা বলতে, নানা লক্ষ্যের মধ্যে সমঝোতা এবং সাবধানতার এই প্রবণতা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় খানিকটা অনিবার্য। সমস্যা সেখানে নয়। প্রশ্ন হল, এই সমঝোতার কাজটা সরকার কতখানি স্বচ্ছতার সঙ্গে করছে? সে দিক থেকে দেখলে এই বাজেট যথেষ্ট হতাশাজনক।

বাজেট বক্তৃতার একেবারে গোড়াতেই জেটলি বললেন, তাঁর লক্ষ্য দেশের আর্থিক বৃদ্ধির হার দ্রুততর করা, বিনিয়োগের পরিমাণ বৃদ্ধি করা এবং সেই সমৃদ্ধির সুফল সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়া। কিন্তু, তাঁর বাজেট বক্তৃতাকেই যদি সরকারের কর্মপদ্ধতির নীলনকশা হিসেবে দেখা যায়, তবে আম আদমির কাছে আর্থিক বৃদ্ধির সুফল পৌঁছে দেওয়ার জন্য তাঁরা সেই ট্রিকল ডাউন তত্ত্বের বাইরে কিছু ভাবতে পারলেন না। অর্থাৎ, তাঁরা বিশ্বাস করেন, আর্থিক বৃদ্ধি হলে তার সুফল আপনিই চুঁইয়ে নামবে গরিব মানুষের কাছে— মজুরি ও কর্মসংস্থানের বৃদ্ধির মাধ্যমে। মুশকিল হল, এই তত্ত্বটির স্বপক্ষে

দেশে-বিদেশে প্রমাণ খুব সীমিত। আর্থিক বৃদ্ধি অবশ্যই গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু তা শুধু শেয়ার বাজারের উর্ধমুখী দৌড় বা বিশ্বের অতি-ধনীদের তালিকায় ভারতীয়দের নাম দেখে গর্বিত হওয়ার জন্যে নয়।

দ্রুততর আর্থিক বৃদ্ধির মাধ্যমে সরকারের রাজস্বের পরিমাণ বাড়বে ঠিকই। কিন্তু, সেই বর্ধিত রাজস্ব দারিদ্র-দূরীকরণ ও মানবসম্পদের বিকাশের জন্যে ব্যবহার করা এবং সেই প্রক্রিয়ার দক্ষতা বৃদ্ধির জন্যে প্রাতিষ্ঠানিক সংস্কার করা ছাড়া 'সবকা সাথ, সবকা বিকাশ' সম্ভব নয়। চিন বা অন্য যে দেশগুলির সঙ্গে সচরাচর ভারতের নাম এক সঙ্গে উচ্চারিত হয়, সেখানে আর্থিক বৃদ্ধির সঙ্গে দারিদ্র হ্রাস পাওয়ার হার ভারতের তুলনায় অনেক বেশি। মোদীর মুখ্যমন্ত্রিত্বে গুজরাতে আয় যতখানি বেড়েছে, বিভিন্ন সামাজিক সূচকের উন্নতি হয়েছে তার চেয়ে ঢের শ্লথ হারে। বস্তুত, ইউপিএ-র শাসনকালের ক্ষেত্রেও এই কথাটি সত্যি। ২০০৪ থেকে ২০১৩ সালের মধ্যে ভারতে আর্থিক বৃদ্ধির গড় হার ছিল ৭.৬ শতাংশ। আর, এই সময়ে দারিদ্র কমেছে বছরে গড়ে ২.২ শতাংশ হারে। মনে রাখা প্রয়োজন, ইউপিএ-র আমলে আম আদমির জন্য প্রচুর কর্মসূচি ছিল, সরকার সে খাতে বিপুল ব্যয় করেছিল। তার পরেও ছবিটা এতখানিই হতাশাজনক। তার মূল কারণ আর্থিক বৃদ্ধির হারের অনুপাতে কর্মসংস্থান, মজুরি এবং দারিদ্র-দূরীকরণ ও মানবসম্পদের বিকাশের জন্যে বিনিয়োগ বাড়েনি।

এই পরিপ্রেক্ষিতে, অর্থমন্ত্রী ভরা সংসদে দাঁড়িয়ে বললেন, গ্রামীণ কর্মসংস্থান যোজনার জন্য তাঁরা রেকর্ড পরিমাণ বরাদ্দ করেছেন। ৩৪,৬৯৯ কোটি টাকা। সত্যি কথাটা হল, গত বাজেটে জেটলিই এই খাতে বরাদ্দ করেছিলেন ৩৪,০০০ কোটি টাকা। অর্থাৎ, বৃদ্ধির পরিমাণ দুই শতাংশ। মূল্যস্ফীতির হারের তুলনায় ঢের কম। অর্থনীতির একেবারে প্রাথমিক স্তরের ছাত্রও বলবে, প্রকৃত বরাদ্দ কমেছে। প্রসঙ্গত, ২০১৩-১৪ অর্থবর্ষে ইউপিএ সরকার এই খাতে বরাদ্দ করেছিল ৩৩,০০০ কোটি টাকা। এবং, অভিজ্ঞতা বলছে, বাজেটে কত টাকা বরাদ্দ হল, সেটা আদৌ মূল প্রশ্ন নয়। সরকার সত্যিই এই খাতে কত টাকা খরচ করছে, সেটাই আসল। এবং, নরেন্দ্র মোদীর সরকার ক্ষমতায় আসার পর থেকেই এই খাতে টাকা পাঠানোর পরিমাণ তলানিতে এসে ঠেকেছে। দুর্নীতি এবং অপচয় রোধের জন্যে এই প্রকল্পের সংস্কার অবশ্যই প্রয়োজন, এবং দারিদ্র দূরীকরণের জন্যে অন্য প্রকল্পের কথাও ভাবা যেতেই পারে, কিন্তু সে সব না করে বাজেটে বরাদ্দ কমানো নিশ্চয়ই সমাধানের পথ নয়।

শুধু তাই নয়, সরকারের প্রথম পূর্ণাঙ্গ বাজেটেই অরুণ জেটলি সামাজিক ক্ষেত্রে ব্যয়বরাদ্দে যে পরিমাণ কাটছাঁট করলেন, তাতে ফলাফল আরও মারাত্মক হওয়াই প্রত্যাশিত। অরুণ জেটলি এই বাজেটে শিক্ষা খাতে মোট ৬৮,৯৬৮ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছেন। গত বাজেটে বরাদ্দ ছিল ৬৮,৬২৮ কোটি টাকা। টাকার অঙ্কেই বৃদ্ধির পরিমাণ ০.৪৯ শতাংশ। স্বাস্থ্যখাতে বরাদ্দ হয়েছে ৩৩,১৫২ কোটি টাকা। গত বছর এই খাতে বরাদ্দের পরিমাণ ছিল ৩৫,১৬৩ কোটি টাকা। মানে, বরাদ্দ সরাসরি কমে গিয়েছে। খাদ্যের অধিকার আইনের প্রসঙ্গটিই বাজেট বক্তৃতায় আসেনি। উন্নয়নের সুফল গরিবের কাছে চুঁইয়ে আসার জন্যও গরিব মানুষের কিছু সক্ষমতা প্রয়োজন। খাদ্য, শিক্ষা, স্বাস্থ্য সেই সক্ষমতার একেবারে প্রাথমিক শর্ত। এক দিকে সরকার আম আদমিকে ট্রিকল-ডাউনের মতো বাতিল তত্ত্বের হাতে সঁপে দিচ্ছে, আর অন্য দিকে তার সক্ষমতা অর্জনের ন্যূনতম শর্তগুলোও পূরণ করছে না— এই পথে অচ্ছে দিন আসবে বলে বিশ্বাস করার কোনও কারণ নেই।

কাদের জন্য অচ্ছে দিন আসবে না, সেটাও স্পষ্ট করে নেওয়া ভাল। ২০১১-১২ সালের হিসেব অনুযায়ী, ভারতে দারিদ্রের অনুপাত ছিল ২৯.৫ শতাংশ। প্রায় ৩৫ কোটি মানুষ। যে দারিদ্ররেখার নিরিখে এই হিসেব, ততটুকু টাকায় কোনও মানুষের পক্ষে বেঁচে থাকা সম্ভব কি না, তা নিয়ে অনতিঅতীতেই জোরদার তর্ক হয়েছে। আজকের শাসকরাই বলেছিলেন, এই দারিদ্ররেখা অবাস্তব। যদি দারিদ্ররেখাটাকে ঠিক দ্বিগুণ করে দেওয়া যায়, সেটাও খুব বেশি হবে না। এবং, তার নীচে থাকবেন দেশের প্রায় ৮০ শতাংশ মানুষ। এই বাজেট তাঁদের সবাইকে বহু দফায় অকার্যকর প্রমাণিত হওয়া ট্রিকল-ডাউন তত্ত্বের হাতে ছেড়ে দিল।

তবে, এই বাজেটে কিছু ইতিবাচক বার্তা আছে। অরুণ জেটলি বলেছেন, তিনি ভর্তুকিখাতে অপব্যয়ের দিকটি খতিয়ে দেখবেন। কর্পোরেট দুনিয়ার ঋণ মকুব করা, কর ছাড় দেওয়ার কথা আপাতত বাদই দিই। যে সব ভর্তুকি গরিব মানুষের বিশেষ কাজে লাগে না— পরিভাষায় যাকে 'নন মেরিট সাবসিডি' বলা হয়— তাতে খরচ হয় দেশের মোট অভ্যন্তরীণ উৎপাদনের নয় শতাংশ। আর, যে গ্রামীণ কর্মসংস্থান যোজনায় ব্যয় নিয়ে এত সমালোচনা, তাতে ভর্তুকির পরিমাণ এই 'নন মেরিট সাবসিডি'-র কুড়ি ভাগের এক ভাগেরও কম। তাই ভর্তুকির অপব্যয় কমানোর প্রচেষ্টা প্রশংসনীয়, কিন্তু প্রধানমন্ত্রী যদি শুধু কর্মসংস্থান যোজনার টাকা কেটেই ভর্তুকি সমস্যার সমাধান করে ফেলার কথা ভাবেন, তবে জন কেনেথ গ্যালব্রেথের একটা পুরনো কথা মনে পড়ে যেতে বাধ্য। রিপাবলিকানদের নীতির প্রসঙ্গে তিনি ঠাট্টা করে বলেছিলেন, অবশ্যই গরিবের ভর্তুকি বন্ধ করা এবং ধনীদের কর ছাড় দেওয়া উচিত। কেন? কারণ, গরিবরা কাজ করতে চায় না কারণ ভর্তুকির দৌলতে তারা বড্ড বড়লোক, আর বড়লোকরা কাজে উৎসাহ পায় না কারণ করের বোঝায় তারা নিতান্তই গরিব!

লন্ডন স্কুল অব ইকনমিকস-এ অর্থনীতির শিক্ষক